মুখস্থের বাইরে

শতদ্রু মজুমদার

--আচ্ছা রোল নম্বর ৬১২ কোন ঘরটা?

ভদ্রলোক হাত তুলে দেখিয়ে দিলেন, ওই যে গাছতলায় চলে যান।

আমি বিড়বিড়িয়ে উঠি, গাছতলায় পরীক্ষা হবে নাকি? ছেলের হাত ধরে পাশে দাঁড়িয়ে আমার বউ। সে ধমকাল, ধ্যাত্--গাছতলায় পরীক্ষা হবে কেন-- গাছের গুঁড়িতে সিট-নম্বর আছে--চলো চলো--। বলতে বলতে সে এগিয়ে চলে। পেছন পেছন আমি। গোটা ইস্কুল চত্বরে যেন মেলা বসে গেছে। খবর যতদূর, এবার হাজারের ওপর বাচ্চা পরীক্ষায় বসছে সিট মাত্র ৫০টা। আমি তাই আশা ছেড়ে দিয়েছি। উমা বলেছে, তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না--যা করার আমি-ই করব।

তা সে যথেষ্টই করেছে। ছেলের দু'দুটো মাস্টার। একজন সকালে। একজন বিকেলে। বাকি সময়টা উমা নিজেই। কখনো মুখস্থ করাচ্ছে। কখনো ধরছে। ঘড়ি ধরে পরীক্ষা নিচ্ছে। তাতে ফল নাকি আশাপ্রদ। শেষের দিকে হুবহু ইস্কুলের ধাঁচে পরীক্ষা নিয়ে ৯০ পর্যন্ত নম্বর উঠেছিল। মুশকিল হল বানিয়েও তো লিখতে হয় কত কী। বিশেষ করে রচনাটা। রসগোল্লা থেকে দুর্গা পর্যন্ত যা খুশি দিতে পারে।

উমা বলছে স্টকে অবিশ্যি সত্তরটার মতো আছে। দশটা নম্বর যা-তা ব্যাপার নয়। কিন্তু আমি যা-তা ব্যাপার ছাড়া তো কিছুই দেখছি না। সিরাজদ্দৌল্লার ইস্তেহারের মতো লম্বা লম্বা কাগজে সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন উত্তর লিখে ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে দিয়েছেন অ্যাডমিশন টেস্ট-এর মাস্টারমশাই। তাঁর মতে এটাই নাকি শিশু শিক্ষার বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতি--একই জিনিস সারাক্ষণ দেখতে দেখতে মনে গেঁথে যাবে।

বাপের জন্মেও শুনিনি এসব। ছেলেটার অন্যকিছু দেখার সুযোগ নেই।

ভাববার অবকাশ নেই। খেতে বসলেই সামনে ঝুলছে ঃ মনীষীদের জন্মদিন, মৃত্যুদিন। শোবার ঘরের দেওয়াল সার সার বুদ্ধির অংক। সেগুলো আবার সপ্তায় পালটে যায়।

সিঁড়ির রেলিংটা ফাঁক ছিল। পরীক্ষার কয়েকদিন আগে দেখি, কোথায় কী কী ঘটেছে। এইসব দেখতে দেখতে বাচ্চা ওঠা নামা করবে। প্রথম ধাপে পা দিলেই গুজরাটে ভূমিকম্প। দ্বিতীয় ধাপে পশ্চিমবঙ্গের বন্যা। পরেরটায় আমেরিকায় বোমা।

দম আমারই বন্ধ হয়ে আসে। তবু কিছু বলার উপায় নেই, ফোঁস করে উঠবে ঃ তোমার কোন ধারণা আছে। কী সাংঘাতিক সাংঘাতিক প্রশ্ন আসে!

আমি আর কী বলব! জেলার একটা সেরা ইস্কুল। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকে স্টারের ছড়াছড়ি। যেনতেন একবার ঢুকিয়ে দিতে পারলে সেই টুয়েলভ ক্লাস পর্যন্ত নিশ্চিন্তে। তাই চারদিক থেকে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে।

পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বছর বছর বেড়েই চলেছে। সুতরাং প্রতিযোগিতা তো হবেই। কিন্তু আমার বক্তব্য শিশুর স্বাভাবিক জগতের দরজা জানলাগুলো বন্ধ করে দিলে তো সে ক্রমশই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠবে। উমা বলে,ওসব ভাবনা পরে। যেভাবেই হোক চান্স পাওয়াতেই হবে।

আমি এখন একটা শিরিষ গাছ তলায়। গাছের গায়ে লটকানো আছে সিট নম্বর, ম নম্বর। দ্রুত খুঁজে ছেলেকে ঠিক জায়গায় নিয়ে যায় উমা। ঘড়িতে ঠিক ১১টা। পরীক্ষা শু হচ্ছে।

--আসলে কী জানেন তো--এটা অ্যাডমিশন টেস্ট নয়, এলিমিনেশন টেস্ট--মানে কী করে বাদ দেবে সেই পরীক্ষা।

--বাদ দেবার জন্যে পরীক্ষা।

--হ্যাঁ, কিচ্ছু করার নেই তো, এগারশো ক্যানডিডেট।

-- আচ্ছা, এত ডিমাণ্ড, আর একটা সেকশান বাড়ায় না কেন?

-- সেটা তো স্কুলের ব্যাপার।

-- প্রাইভেট হলে ঠিক করতো।

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দুই মহিলার কথোপকথন শুনতে ভাল লাগছিল না। একে - তাকে পাশ কাটিয়ে পাঁচিলের ধারে দাঁড়ালাম। ওপারে একটা বিশাল পুকুর। স্থির কালচে জল কেটে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে চলেছে হাঁসের লাইন। দূরে কোথায় গান বাজছে ঃ যদি কিছু আমারে শুধাও কি যে তোমারে কব.....।

হঠাৎ শুনলাম ঃ অংকটার জন্যই আমার যত চিন্তা - চারটে যদি রাইট করতে পারে , চব্বিশটা নম্বর ছাঁকা! মুখটা ঘুরিয়ে দেখি, পেপসি - হাতে একটা বউ! অন্যজন বলল, আমি তো বলে দিয়েছি, ফেটে গেলে পচে গেলে উড়ে গেলেই বিয়োগ! চোখের মণি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলেই চলেছে।

ঠোঁটের কষ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে রঙিন জল। আমার চোখাচোখি হতেই হাতের চেটো দিয়ে মুছে নিয়েই ফের শু করল। ইস্কুলময় এইসব। এই ঘেরাটোপের বাইরে যেতে গেলে আমাকে স্কুল কমপাউণ্ড থেকে বেরিয়ে যেতে হয়।

ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে এদিক- সেদিক তাকিয়ে বউকে খুঁজতে থাকি। রংবেরঙের শাড়িতে ছয়লাপ। আনাচে কানাচে মহিলা। ছোটখাটো চেহারার মানুষটাকে ঝট্ করে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। যতদূর অনুমান, ছেলেটা যে ঘরে বসেছে, তার চারধারে ঘুর ঘুর করছে হয়ত। পারলে দেওয়াল ফুঁড়ে ভেতরে ঢুকে যায়।

সত্যি,মাথা খারাপ করে ফেলছে একেবারে। কী, না এটাই লাস্ট--সাত বছর হয়ে গেলে আর তো বসতে পারবে না।

একটা বাচ্চা বেরিয়েছিল বাথম যাবে বলে। তার পেছন পেছন একদল মা। ঘিরে ফেলেছে ছেলেটাকে। একজন গার্ড ওপরের বারান্দা থেকে চিৎকার ছাড়ল ঃ ওকে যেতে দিন, যেতে দিন--ডিস্টার্ব করবেন না!

সবাই সরে যায় একটু। দুধারে সার সার বাবা-মা। মাঝখান দিয়ে রাজার মতো হেলতে দুলতে বাচ্চাটা চলে গেল। সকলের চোখে মুখে হতাশা। ঘুরে দাঁড়িয়ে

একজন বলল, সেয়ানা বাচ্চা--কিছুতেই মুখ খোলে না।
ঘন্টা খানেক সময় কেটেছে। ঘুরতে ঘুরতে আমি একবার বাইরে চলে আসি। সিগারেট কিনব। পাশা-পাশি হাঁটছে একটা ছেলে। মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার ছেলে কি এই প্রথম?
বললাম, না। কেন বলুন তো?
হাতে একটা ছাপানো কাগজ ধরিয়ে দিয়ে সে বলল, আমি অ্যাডমিশন টেস্ট-এর কোচিং করি। গত বছর আমার তিনটে ক্যানডিডেট চানস্ পেয়েছিল। আমি চুপ। ভাগ্যিস উমার সঙ্গে আগে যোগাযোগ হয় নি।
সে বলল, এতে আমার ফোন নম্বর, ঠিকানা দেওয়া আছে। ছেলেটাকে পাশ কাটিয়ে একটা গুমটির সামনে দাঁড়াই। ততক্ষণে সে আর একজনকে বোঝাতে শু করে দিয়েছে।
অনেকক্ষণ দেখা নেই উমার সঙ্গে। এক কাপ চা ছাড়া আর কিছুই তো খেয়ে আসে নি। শরীরের অবস্থাও ভাল নয়, মাথা ঘুরে পড়ে গেলেই হয়েছে আর কি। এমনিতেই হাই প্রেশার। তার ওপর প্রচন্ড অনিয়ম। উমা বলেছে, আজকের দিনটা যাক্, প্রেশার আপনি কমে যাবে।
আমি আবার ইস্কুলে ঢুকলাম। নুড়ি বিছানো লম্বা পথ বরাবর হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দেখি, উমা। যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এল। হাঁপাচ্ছে বেশ। দ্রুত ওঠানামা করছে বুক।
--কী হল, শরীর খারাপ করল নাকি?
সে বলল, অংক বোধ হয় খুব শক্ত এসেছে। বললাম, তুমি কিছু খাবে?
ও বলল, তিন নম্বর ঘরের একজন কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে পড়েছে--একটা অংকও পারে নি। এইসব বলছে আর চোখ থেকে সানগ্লাসটা খুলছে, লাগাচ্ছে। ফরসা মুখটা লাল হয়ে উঠছে ক্রমশ। চোখের কোলে ঘাম। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে। আমি বললাম, ওসব কথা ছাড়ো তো!
কিছু-না-বলে আবার ভিড়ে মিলিয়ে গেল সে। ফের একটা ছেলে আসছে। ফের ঘেরাও। ভারী চেহারার একটা বউ এগিয়ে গেল, দেখি সন সন ও অসুস্থ।
--কী সোনাই হয়ে গেল?
--মা, আমি আর পরীক্ষা দোব না।
--ওমা, কেন?
--আমার ভাল লাগছে না--
--সব করছো তো?
--হ্যাঁ।
--অংক করেছো সব?
বাচ্চাটা নিত্তর।
--রচনা লিখেছো? কী রচনা দিয়েছিল। রিভিশান দিয়েছো?
ছেলেটা বমি করে দিলে হড়হড় করে । সবাই পিছিয়ে আসে একটু। অসুস্থ বাচ্চাটাকে টানতে টানতে ওর মা নিয়ে চলেছে। পেছন পেছন দুচারজন। এখনো আশা ছাড়েনি--যদি দু একটা জানা যায়। আমি ঘড়ি দেখলাম। আরও আধঘন্টা বাকি। একসময় উমাকে বললাম, চলো একটু চা খেয়ে আসি।
ও বলল, তুমি যাও।
আমি গেলাম না। সিগারেট ধরালাম। চারদিকে মানুষের মাথা। খুব সাবধানে ধোঁয়া ছাড়ি। খালি পেট চারিয়ে পাতলা ধোঁয়া একেবারে ওপর মুখো হয়ে সরাসরি বাতাসে মিশিয়ে দিচ্ছি। তবু এক মহিলা কটাক্ষ চোখে মুখে আঁচল চাপা দিল।
সূর্য মাঝ আকাশে। কোথাও এতটুকু ছায়াও নেই। লম্বা লম্বা গাছগুলোর ছায়া পড়েছে মানুষের মাথা টপকে বাড়ির দেওয়ালে। কারোর মাথায় মাল, কারোর মাথায় খবরের কাগজ। ঘোমটাও দিয়েছে কেউ কেউ। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, উমা একজনই নয়--হাজারে হাজারে। যেন এই ইস্কুলে ছেলেকে ভর্তি করাতে না পারলে মা হিসেবে জীবন ব্যর্থ।--যেন পৃথিবীতে একটাই স্কুল।
অতঃপর পরীক্ষা শেষ হল। লাইন দিয়ে বাচ্চারা বের হয়ে আসছে। আবার বড়দের হুড়োহুড়ি। আবার কর্তৃপক্ষের ধমক ঃ আপনারা বাচ্চাদের মতো আচরণ করবেন না।
কে কার কথা শোনে! যে যার নিজেরটাকে নিতে ব্যস্ত।
ওই যে আসছে আমার ছেলেটা। মুখে রাজ্যজয়ের হাসি। এগিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়াল, উমা, যেন হারিয়ে যাওয়া বাচ্চাকে খুঁজে পেয়েছে। আমি ছেলের হাত থেকে ঝটপট পেন্সিল বক্স, ওয়াটারবটল নিয়ে নিলাম।
গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে উমা বলল, সব লিখেছো তো তাতাই?
--হ্যাঁ। মা, আমি রচনাটা লিখতে পারি নি।
--ওমা, সে কী! কী দিয়েছিল?
--তোমার মা।
চোখ মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল উমার। রচনা কমন আসেনি। বলল, একটুও না?
ছেলেটা আমতা আমতা করল, শুধু লিখেছি--আমার মায়ের নাম--উমা রেগে গিয়ে বলে, আঃ শুধু নাম কেন? আর কিছু লেখ নি?
আমি চুপচাপ। গতবারের পরীক্ষায় রচনা এসেছিল পিঁপড়ে--যতদূর জানি, সেটাও তো বানিয়ে লিখেছিল--।
ভয়ার্ত চোখে তাতাই একবার ওর মাকে দেখছে, একবার আমাকে। দু'ধারে জনস্রোত। আস্তে করে সে বলল, কী করে লিখবো--মুখস্থ নেই তো!

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com